টর্নেডোর কাছে পরাজিত মানুষ

মাত্র ১০ মিনিটের টর্নেডোতে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় বিস্তৃর্ণ জনপথ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। কালবৈশাখের তীব্র ছোবলের পর অসহায় আহত মানুষকে উদ্ধারে দেখা যায়নি পরিকল্পিত উদ্যোগ। প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে আহত মানুষ। ত্রাণ তৎপরতা চলছে অপ্রতুল। এখনও মানুষ খোলা আকাশের নীচে...

লিখেছেন **রাকিব হাসনাত সুমন**

নূরজাহান বেগম। আদর করে সবাই ডাকত রূপজান। হাসিমাখা কথায় ভুলিয়ে রাখতো সবাইকে। প্রবল টর্নেডোর হাত থেকে সবাইকে বাঁচাতে এগিয়ে এসে নিজেই হারিয়ে গেলো চৌদ্দ বছরের রূপজান। নিজেদের একতলা দালানে আশ্রয় নিতে চিৎকার দিয়ে প্রতিবেশীদের ডেকেছে সে। কিন্তু হঠাৎ করেই দালানটি ভেঙে পড়লে চাপা পড়ে সবার প্রিয় রূপজান। রূপজানকে আগলে রাখতো সব সময় যে চাচী সেই বকুল (৩৫) দৌড়ে তাকে বাঁচাতে গেলে দু'জনকেই প্রাণ হারাতে হয়।

এমদাদুল হক (২৮)। শক্ত সমর্থ যুবক। নেত্রকোনার কাঞ্চনপুর গ্রামে নিজের বাড়ির কাছেই ছিলেন তিনি। সন্ধ্যা মাত্র হয়েছে বলে ধীরে সুস্থে হাঁটছিলেন। এমনি সময় শুরু হয় দানবীয় টর্নেডো। ছোঁ মেরে নিয়ে যায় তাকে। অন্তত একশ' গজ দূরের একটি গভীর জলাশয় ভাওয়াল বিল থেকে ২৪ ঘন্টা পর তাকে উদ্ধার করা হয়।

কারি জিন্নত আলী। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের সুমুনিয়াপাড়া গ্রামের মসজিদের ইমাম। বড় মেয়ে মিনারা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। আর ছোট মেয়ে দিলারার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। বড় বোনের সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রায়ই বায়না ধরতো সে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, পিতার সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেয় তারা। ঘটনা চক্রে বেঁচে যায় মিনারা-দিলারার মা শাহানা বেগম (৩০)। এখন বেঁচে থাকার কষ্টটাই তার জন্য অচিন্তনীয়। নেত্রকোনার উলুয়াটি গ্রামের বংশীবাড়ি। বাড়ির বড় ছেলে বাচ্চু মিয়ার (৬০) দাবি অনুযায়ী তাদের প্রধান

ঘরটি একশ' বছরের পুরনো ছিল। তার বাবা শাহনেওয়াজ ২০০১ সালে ১১০ বছর বয়সে ওই বাড়িতে মারা গেছেন। তার দাদা জীবনের শুরুর দিকেই ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন শুনেছে তার পিতার কাছ থেকেই। টর্নোডোতে ইট রডে নির্মিত পিলার আর গজারি কাঠে নির্মিত ঘরটি উড়ে গেছে প্রায় বিশ গজ দূরে।

নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহের টর্নেডো এভাবে বদলে দিয়েছে অনেক পরিচিত দৃশ্য। মাত্র কয়েক মিনিটে, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে

হয়েছে এ পরিবর্তন। নববর্ষে সারা দেশ যখন উদ্বেলিত, এ দেশের মানুষ যখন বর্ষবরণের আনন্দে অবগাহন করছে, ঠিক সেদিনেই সন্ধ্যায় নেত্রকোনা জেলার সদর ও পূর্বধলা উপজেলা এবং ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাটের কয়েকটি গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে যায় ভয়াবহ টর্নেডো। মাত্র তিন মিনিটে লোকালয়কে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দানবীয় এ টর্নেডো। এসব স্থানের দুটি জেলার প্রায় ৩৫টি গ্রাম লন্ডভন্ড করে দেয় বিধ্বংসী টর্নেডো। কয়েক মুহূর্তের এ তান্ডবে প্রায়

নব্বই মানব সন্তানের চিহ্ন মুছে গেছে। আহত হয়েছেন কয়েক হাজার নারী-পুরুষ-শিশু। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন বেশ কয়েকজন। শুধু নেত্রকোনাতেই এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪তে। অন্যদিকে হালুয়াঘাটে নিহত হয়েছে ৩১ জন। ঘটনার পর থেকে খোলা আকাশের নিচে এখনো অবস্থান করছে হাজার হাজার অসহায় নারী-পুরুষ।

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো লোকালয়

১৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় নেত্রকোনো ও হালুয়াঘাটের ওপর দিয়ে বয়ে যায় টর্নেডো। মাত্র তিন মিনিটেই পাল্টে যায় লোকালয়ের চিত্র। নেত্রকোনো জেলা সদর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে অনেকগুলো গ্রাম আক্রান্ত হয় টর্নেডোতে। জেলা সদরের এতো কাছের হওয়া সত্ত্বের গ্রামগুলো খুবই অনুন্নত। বিদ্যুৎ নেই। কৃষি ও গৃহস্থালী তাদের পেশা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। বাজার থেকে পুরুষরা নিজ নিজ গৃহে ফিরছিলেন। আর গৃহিণীরা ব্যস্ত ছিলেন রাতের খাবার তৈরিতে। ঠিক এ সময়টিতেই শুরু হয় দমকা হাওয়া। সঙ্গে কিছুটা শিলা বৃষ্টি। দু'এক মিনিটের মধ্যেই তা রূপ নেয় টর্নেডোর। প্রবল গতির বাতাস তছনছ করে দেয় সবকিছু। উড়ে যায় বাড়িঘর, গাছপালা। অধিকাংশ বাড়ি ছিল টিনের তৈরি। বাতাসে টিন উড়তে থাকে খরকুটোর মতো। ওদিকে ভয়ে এদিকে সেদিক দৌড়াতে থাকে অনেকে। আবার ঘরের মধ্যে খাটের নিচে আশ্রয় নেয় কেউ কেউ। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। নেত্রকোনার অনেকগুলো গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ওই দিনই উদ্ধার হয় অনেকগুলো লাশ। বাতাস থামলে জেলা শহর অভিমুখে শুরু হয় আহতদের মিছিল। এগিয়ে আসে সাধারণ মানুষ। বাস-ট্রাকসহ সব ধরনের যানবাহন যেতে আক্রান্ত হয় গ্রামগুলোতে। নেত্রকোনা হাসপাতাল থেকে কয়েকশ' আহতকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ময়মনসিংহে। হালুয়াঘাটেও একই অবস্থা। ওই রাতেই দু'স্থানে মৃত্যবরণ করে ৩৫ জন। পরদিন ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় অনেক লাশ। সর্বশেষ নেত্রকোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪তে। ওদিকে হালুয়াঘাটে মৃত্যু হয়েছে ৩১ জনের। টর্নেডোর দুদিন পরও নেত্রকোনায় ধানক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয়ে কিশোরী মাজেদার মুন্ডুহীন লাশ। বাঁশঝাড়ে সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধার মৃতদেহ।

আশ্রয়, ত্রাণ, ওষুধ, খাবার পানি, খাদ্য কিছুই নেই

নেই, নেই এবং নেই। এ ছিল টর্নেডোর পরের তিন দিনের চিত্র। মানুষ ত্রাণের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। বিশুদ্ধ পানির অভাবে পুকুরের পানিও পান করতে দেখা গেছে অনেককে। ওষুধ না পেয়ে ক্ষতস্থান শুধু কাপড় দিয়েই বেঁধে রেখে বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন এমন চিত্রও দেখা গেছে। টর্নেডোর পরের তিনদিন খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার মানুষের এ দুঃসহ পরিস্থিতি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মতো নয়। অসহায় মানুষ এক ফোঁটা বিশুদ্ধ পানি পায়নি। বিশেষ করে আক্রান্ত দুর্গম এলাকাগুলোতে ত্রাণ যায়নি দুদিনেও। বহু স্থানে কেউ খোঁজই নেয়নি।

দুর্যোগ প্রাক-প্রস্তুতি
কাগজে কলমে

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য**

দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সারা বছর ধরে সরকারে চলে নানা কর্মযজ্ঞ। দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য রয়েছে একাধিক কমিটি। চলে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ট্রেনিং প্রোগ্রাম, সভা সেমিনার। বেসরকারি বিভিন্ন এনজিও সম্প্রতি দুর্যোগ মোকাবেলায় গ্রাম পর্যায় কাজ করছে। রয়েছে আন্তজার্তিক প্রতিষ্ঠান। অথচ বাস্তবে দুর্যোগ ছোবল হানার পর প্রাক-প্রস্তুতির লেশ মাত্র দেখা যায় না। ত্রাণ কার্যে নানা ব্যর্থতা দেখা যায়। অসহায় মানুষকে নিয়ে শুরু হয় রাজনীতি। প্রধানমন্ত্রী ছুটে যান দুর্গতদের পাশে। তিনি গিয়ে বলেন, সব সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে। টেলিভিশনে দেখানো হয় ত্রাণ দেয়ার সচিত্র প্রতিবেদন। বিরোধীদলীয় নেতা গিয়ে বলেন, অসহায় মানুষ ত্রাণ পাচ্ছে না। ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। বাস্তবে দুর্যোগ মোকোবেলায় প্রাক-প্রস্তুতি অর্থহীন হয়ে ওঠে।

পয়লা বৈশাখ নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহে কালবৈশাখী তীব্র আঘাত হানে। ১০ মিনিটব্যাপী ভয়ঙ্কর কালবৈশাখীতে লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে কয়েকটি গ্রাম। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় অতীতের চিত্রই ফুটে উঠল। টর্নেডোর একদিন পর দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ডাক্তার, ওষুধ, খাদ্য সংকট দেখা দেয়। জানা গেছে, শুধু প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে ঝড়ে আহত বেশ কয়েকজন লোক মারা গেছে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় মহাযজ্ঞ

দুর্যোগ কখনই বলে আসে না। হঠাৎই আসে। তবে দুর্যোগ আসার নিদিষ্ট কাল রয়েছে। কালবৈশাখী আসে চৈত্রের শেষ, বৈশাখের প্রথম দিকে। অশ্বিনী ঝড় হয় আশ্বিন মাসে। জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে দেশে বন্যা দেখা দিতে পারে। উপকূলীয় সাইক্লোনের আভাস এক মাস আগে পাওয়া যায়। এসব জেনেই প্রাক দুর্যোগ প্রস্তুতি নেয়ার কথা।

তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানিয়েছে, প্রাক দুর্যোগ প্রস্তুতি সরকারের বেশ ভালো। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রাক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য নানা কার্যক্রম রয়েছে। রয়েছে তিনটি জাতীয় কমিটি। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রয়েছে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল। এ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ত্রিশ। কাউন্সিলে প্রধানমন্ত্রী বাদে ১১ জন পূর্ণ মন্ত্রী। সেনা, নৌ, বিমান প্রধান মন্ত্রিপরিষদের। ১২ জন সচিব। সদস্য পরিকল্পনা পরিষদ। পিএমও এবং সশস্ত্র বাহিনী প্রধান। এ কাউন্সিল অন্তত বছরে দু'বার সভা করে। জরুরি ভিত্তিতেও মাঝে মাঝে সভা ডাকে। এ কাউন্সিলের মূল কাজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিনির্ধারণ ও এ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করা। দুর্যোগ বিষয়ে স্থায়ী আদেশাবলি এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদন করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর নেতৃত্বে রয়েছে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি। এ কমিটিতে রয়েছেন ২৪ জন সচিব। মহা-পরিচালক এনজি বিষয়ক ব্যুরো, মহাপরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, মহাপরিচালক ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, মহাসচিব রেড ক্রিসেট সোসাইটি।

আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কাউন্সিলের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রস্তুতি, মোকাবেলা পুনর্বাসন বিষয়ক কর্মকান্ডের তদারক। অগ্রগতি জাতীয় দুর্যোগ কাউন্সিলকে অবহিত করা। প্রতি ছয় মাস অন্তর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থার দুর্যোগ প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ তৎপরতা সমন্বয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য রয়েছে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি। এ কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিয়োজিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান হবে। সরকারি ও বেসরকারি

নেত্রকোনার উলুয়াটি গ্রামের সাবেক মেম্বার নইমউদ্দিন শনিবার দুপুরে বলেন, তাদের গ্রামটি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অথচ কেউ খোঁজই নিলো না। রবিবার ওই গ্রাম পরিদর্শনকালে টর্নেডোতে আহত জমিলা আক্তার (৪০) বলেন, টর্নেডোর আঘাতে তার ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। ঘর চাপা পড়ে মারা গেছে তার সন্তান ও শ্বশুর। কিন্তু প্রশাসনের কেউ তার কোনো খবর নেয়নি। তবে বেসরকারিভাবে সাধারণ মানুষ ও বেশ কিছু সংগঠন খাবার আর পানি বিতরণ করেছে। যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই কম। তারপরও মানুষ তাদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে।

আক্রান্ত গ্রাম ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

নেত্রকোনা সদর ও পূর্বধলা উপজেলার প্রায় অর্ধশত গ্রামে আঘাত হানে এ টর্নেডো। সদর উপজেলার মৌগাতি, রৌহা ও মেদনী ইউনিয়ন এবং পূর্বধলা উপজেলার সদর ধলামূলগাঁও, হোগলা ও আগিয়া ইউনিয়নেই বেশি আঘাত হানে এ টর্নেডো। পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কাঞ্চনপুর, গর্দী, উলুয়াটি, ফাইচকা, আতকাপাড়া, চুচাউরা ও পূর্বধলার কয়েকটি গ্রাম। ওদিকে হালুয়াঘাটে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুমুনিয়াপাড়া গ্রাম। এ গ্রামেই নিহত হয়েছেন প্রায় ১৫ জন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কালিয়ানী কান্দা, গাজিরভিটা, লামুক্তা, বোয়ারমারা গ্রামও। নেত্রকোনার ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলো পরিদর্শন করে দেখা গেছে অবিশ্বাস্য চিত্র। পুরো কাঞ্চনপুরে মাত্র একটি বেড়ার ঘর ছাড়া বাকি সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। গর্দী গ্রামে একতলা দালান পর্যন্ত মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে ভয়াল টর্নেডো। জেলার ক্ষতিগ্রস্ত অন্য গ্রামগুলোর মধ্যে রয়েছে হাটখোলা, মাধবপুর, জয়নগর, কয়ারকান্দা, মনকান্দিয়া, হাশিমপুর, দুর্গাপুর, বনগাঁও, কয়রাটি, দিগজান, মনোয়াচুরি, হাজিরপুর, নাচনাপুর, বানিপুর, জামতলা, কুমরি, রৌহা, চাপারকোনা প্রভৃতি গ্রাম।

তবে নেত্রকোনা জেলা প্রশাসন সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবেই বলেছে, টর্নেডোতে ৪৫টি

প্রতিষ্ঠানে ৩০ জনকে নিয়ে এ উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। এ কমিটির অন্যতম কাজ দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশাসন, প্রস্তুতি, জরুরি মোকাবেলা, পুনর্বাসন, পুনঃনির্মাণ, টেকনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ও আর্থ সামাজিক বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে পরামর্শ প্রদান করা। এ কমিটি দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করে।

সর্বোপরি রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এ ধরনের মন্ত্রণালয় রয়েছে বলে জানা গেছে। এ মন্ত্রণালয়েই সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট। এ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে একজন পূর্ণ মন্ত্রী। সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব পদে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা। এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, কর্মকর্তাদের পুষতে সরকারের মাসে কোটি টাকা লেগে যায়। কার্যত দুর্যোগ নিয়ে সারা বছরই মেতে থাকে এ মন্ত্রণালয়। প্রতি তিন মাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকা ও জনসাধারণকে চিহ্নিত করাও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাজ। এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ অবস্থা সঠিক মনিটরিং করে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো। '৯২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সৃষ্টি করা হয়।

এ ব্যুরোর কাজ স্বাভাবিক অবস্থায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সব বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, দাতা সংস্থা, এনজিওরা সমন্বয় করে। দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রস্তুতি ও প্রশমন বিষয়ক আইন ও নির্দেশাবলী ব্যুরো প্রণয়ন করে।

দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডারে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। জানা যায়, দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দেশে অর্ধশত এনজিও কাজ করছে। রেড ক্রিসেন্ট, স্কাউট, অক্সফ্যাসের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও কাজ করছে।

দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সরকারে জিআর, কাবিখাসহ খাদ্য সাহায্য রয়েছে। ত্রাণ পরিচালনার জন্য রয়েছে কোটি টাকার বাজেট। প্রায় চারশত কোটি টাকার বাজেট রয়েছে দুর্যোগ মোকাবেলায়। জানা গেছে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন মিটিংয়ে বছরে কোটি টাকা সরকারের খরচ হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য খুবই ভালো উদ্যোগ রয়েছে। কার্যত এ উদ্যোগ ফলপ্রসূ হচ্ছে না। দুর্যোগকবলিত এলাকায় দ্রুত ত্রাণ ও চিকিৎসা তৎপরতা পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। পরিস্থিতি মোকাবেলায় দায়সারা আচরণ চলে।

নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ টর্নেডো : একই চিত্র

সারা দেশ যখন বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখকে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত, তখন প্রবল টর্নেডো আঘাত হানলো নেত্রকোনো সদর, পূর্বধোলা, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট। মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো গোটা এলাকা। মাত্র ১০ মিনিটের কালবৈশাখীতে পুরো এলাকা ধ্বংসলীলায় পরিণত হলো। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ খোলা আকাশের নিচে রয়েছে। পরিকল্পিত কোনো ত্রাণ তৎপরতা এলাকা ঘুরে দেখা যায়নি। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী দুর্যোগপ্রবণ এলাকা ঘুরে গেছেন। চেয়েছেন রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে।

ত্রাণ মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, নেত্রকোনায় ১ হাজার ২৫০ এবং নেত্রকোনায় ৫০০ বান্ডিল ঢেউ টিন দেয়া হয়েছে।

খয়রাতি চাল দেয়া হয়েছে ৫০ মেট্রিক টন। শাড়ি বিতরণ করা হয়েছে এক হাজার পিস। সরেজমিন দুর্যোগ এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ মানুষ এখনও ত্রাণ পায়নি। তারা খোলা আকাশের নিচে রয়েছে।

ত্রাণ মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মোকাবেলার জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে জরুরি ত্রাণ দেয়া থাকে। এ ত্রাণ দ্রুত পৌঁছে দেয়ার কথা। তবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ত্রাণ সব সময় দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হয় না। কে বা কারা ত্রাণ পাবে তা জেলা প্রশাসককে জরিপ করতে হয়। ২/১ দিন সময় লাগতে পারে।

সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সচিব ফজলুল রহমান ২০০০কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে সরকারের প্রস্তুতি সম্পর্ক বলেন, দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতি রয়েছে। রয়েছে বেশ কয়েকটি কমিটি। তবে কিছু জটিলতার কারণে ত্রাণ তৎপরতা দ্রুত করা সম্ভব হয় না। কালবৈশাখী হঠাৎ হয়। কোথায় আঘাত হানবে কয়েক ঘন্টা আগেও জানা যায় না। এ কারণে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়া সম্ভবও হয় না তবে উপকূলীয় সাইক্লোন মোকাবেলায় সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে। দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি খাতা-কলমে বেশি। বাস্তবে নেই। এ কারণে দুর্যোগ-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় অরাজক এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ কারণে দুর্যোগ বিশেষজ্ঞদের অভিমত, প্রাক-দুর্যোগ প্রস্তুতি হওয়া প্রয়োজন কত দ্রুত দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় চিকিৎস, ত্রাণ, আশ্রয়, নিরাপত্তা পৌঁছে দেয়া সম্ভব। কাগজে কলমে নয়, দুর্যোগ ও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রাক দুর্যোগ প্রস্তুতি বাস্তবমুখী হওয়া প্রয়োজন।

গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মৃত্যুবরণ করেছেন ৪৭ জন। ৭৫৪টি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। তিন হাজার পরিবার ক্ষতির শিকার হয়েছে, যার মোট সদস্য প্রায় ২০ হাজার। ধ্বংস হয়েছে ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ত্রাণ তৎপরতা ও পুনর্বাসনে চরম শ্লথগতি

ভয়াবহ টর্নেডোতে অন্তত ২০ হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রশাসনের ত্রাণ তৎপরতা ছিল খুবই সীমিত। ঘটনার পর অন্তত দুদিন প্রশাসনের তেমন কোনো তৎপরতা চোখে পড়েনি। তবে সাধারণ মানুষ ও বেসরকারি উদ্যোগে ত্রাণ সরবরাহ, উদ্ধার তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। আশপাশের এলাকা থেকে মানুষ যেভাবে পেরেছে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো অর্থ সংগ্রহ করে ব্যাপক ভিত্তিক ত্রাণ সরবরাহের চেষ্টা করেছে। ঘটনার এক দিন পর সেনাসদস্যরা তাঁবু সরবরাহ শুরু করলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। প্রতি চারটি পরিবারের জন্য মাত্র একটি করে তাঁবু দেয়া হয়। ১৭ এপ্রিল নেত্রকোনার উলুয়াটি গ্রামে কোনো ত্রাণ তৎপরতা চোখে পড়েনি। তবে টর্নেডোর পর ওই দিনই প্রথম সেনাসদস্যরা সেখানে মাত্র ৩০টি তাঁবু দিয়েছেন। স্থানীয় মেদনী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা শামছুদ্দিন খান জানান, তার এলাকায় ৫১১টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১ হাজার ১৪৪টি ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। ক্ষতির শিকার হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। অথচ শনিবার সকাল পর্যন্ত তিনি কোনো ধরনের সরকারি সহায়তা পাননি বলে জানান।

সোমবার নেত্রকোনা জেলা প্রশাসন সরবরাহকৃত ত্রাণের তালিকা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ৭৫০ বান্ডিল ঢেউটিন, পুনর্বাসনের জন্য ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা, ৫০ হাজার টাকার খয়রাতি সাহায্য, ১০০ মেট্রিক টন চাল, ৩০০ শাড়ি, ৩০০ লুঙ্গি, ১ হাজার টিন বিস্কুট ও ১ হাজার পানির ক্যান। এছাড়া সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ৩৫০টি তাঁবু দুর্গতদের

দেয়া হয়েছে দেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।

ভিভিআইপিদের সফর ও দুর্গতদের প্রাপ্তি

টর্নেডো আঘাত হানার এক দিন পর থেকেই নেত্রকোনা ও হালুয়াঘাটের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর শুরু করেন ভিভিআইপিরা। পরদিন উপদ্রুত এলাকায় যান ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী চৌধুরী ইবনে ইউসুফ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। এরপর একই দিনে ঘটনাস্থলে যান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। এদিন প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে বিতরণ শুরু করার জন্য তাঁবু ঘটনাস্থলে নেয়ার পরও দুর্গতদের মধ্যে দেয়া হয়নি। এর পরদিন দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও বর্তমান সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। বি. চৌধুরী প্রশাসনের মাধ্যমেই তাদের ত্রাণসামগ্রী বিতরণের প্রস্তাব দিয়েছেন। বন ও পরিবেশ মন্ত্রী শাজাহান সিরাজ যান সোমবার। এতো ভিভিআইপির সফর ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ প্রশাসনকে এসব ভিভিআইপির সফর নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে বিঘ্নিত হয় ত্রাণ তৎপরতা। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় নতুন পরিস্থিতি।

হালুয়াঘাটে লুটপাট-চাঁদাবাজি : অসহায় মানবতা

একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে

লুটেরা। এ দুয়ের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে হালুয়াঘাটের বিপন্ন মানুষ। টর্নেডো বিধ্বস্ত গ্রামগুলোতে হাহাকার না কাটতেই শুরু হয় লুটেরাদের তৎপরতা। টর্নেডো যা রেখে গেছে তার অনেকটাই নিয়ে নিয়েছে লুটেরারা। অসহায় মানুষের চোখের সামনেই এগুলো ঘটলেও প্রতিরোধের কোনো শক্তিই তাদের ছিল না। হালুয়াঘাটের সুমুলিয়া গ্রামের হাসিনা বেগম জানান, তার ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু আলমারি মোটামুটি অক্ষত ছিল। তবে পরদিন একদল দুর্বৃত্ত আলমারি ভেঙে সেখানে রক্ষিত টাকাসহ যা পেয়েছে সবই নিয়ে গেছে। রেখে যায়নি কিছুই। অসহায় হাসিনা বেগম পাল্টা জানতে চান, আমার এখন কি হবে বাবা? ওই গ্রামের রিতাজ বেগম জানান, তার ট্রাঙ্ক ভেঙে লুটেরার দল ২ হাজার টাকা নিয়ে গেছে। শুধু টাকা-পয়সাই নয়, দুর্বৃত্তরা এ সুযোগে একজন কৃষকের জমি থেকে প্রায় ২ হাজার তরমুজ পর্যন্ত চুরি করেছে। অসহায় মানুষ চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও লুটেরা আতঙ্কে দিনাতিপাত করছে।

ও দিকে ওই এলাকায় অপর এক দল দুর্গতদের সাহায্যের নামে শুরু করে চাঁদাবাজি। তারা বিধ্বস্তদের বাড়িঘরে, রাস্তার মোড়ে, পথেঘাটে বসে পড়ে টাকা আদায়ের জন্য। কিন্তু এসব টাকা দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করতে দেখা যায়নি। বরং স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, মানুষের নামে চাঁদা তুলে চাঁদাবাজরা নিজেদের পকেটস্থ করছে।

দুর্গতদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি

খাবার, ওষুধ আর অর্থের অভাব দুর্গতদের অসহায় করে তুলেছে চরমভাবে। ফলে ভিক্ষায় নেমেছে তারা। নেত্রকোনা আর হালুয়াঘাটের দুর্গত এলাকাগুলোতে অসহায় আহত মানুষের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় বসে থাকাটা স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। রবিবার নেত্রকোনার উলুয়াটি গ্রামের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এমন অনেককে দেখা গেছে টাকা চাইতে, যারা সবসময় অন্যকে সহায়তা করেছেন। জীবনে কারো কাছ থেকে কোনো কিছুই চেয়ে নেননি। অথচ ভাগ্য বিড়ম্বনায় আজ তারাই নেমেছেন ভিক্ষাবৃত্তিতে। ওই গ্রামের মুজিবুর হাতে ব্যান্ডেজ নিয়েই টাকা চাইছিলেন। ভিক্ষা করছেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন, কি করবো! পরিবারের সবাই হাসপাতালে। অথচ একটি টাকাও নেই। উপায় কি আর। একই অবস্থা হালুয়াঘাটেও। সেখানকার গাজীরভিটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন বলেন, সরকারি বরাদ্দ বিতরণে ঢিলেমির কারণেই মানুষের চরম দুর্দশা দেখা দিয়েছে।

আবার জীবন শুরুর উদ্যোগ

তিন দিন খোলা আকাশের নিচে দিন-রাত কাটানোর পর ঘটনার আকস্মিকতা কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠেছেন মানুষ। রবিবার থেকেই আবার তারা স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা শুরু করেছেন। দুর্গত এলাকাগুলো ঘুরে দেখা গেছে, অনেক স্থানে মানুষ নিজ উদ্যোগেই নিজের ভিটার ওপর থাকার আয়োজন করছেন। যে যেভাবে পারছেন চেষ্টা করছেন থাকার জায়গাটুকু অন্তত ঠিক করে নিতে। অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনও তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার তাদের এ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করছেন সাধারণ মানুষ। তবে অর্থের সংকট মানুষের দুর্দশাকে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকগুণ। প্রায় নিঃস্ব হয়ে যাওয়া পরিবারগুলো কার্যত অর্থের অভাবেই অসহায় হয়ে পড়েছেন বেশি করে। অর্থ না থাকায় ইচ্ছে থাকলেও তারা কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারছেন না। আবার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যরা সার্বক্ষণিকভাবে মানুষের কাছে থাকলেও ব্যাপকভিত্তিক সহযোগিতার অভাব বোধ করছেন। কোনো কোনো স্থানে চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের অসহায়ভাবেই দাঁড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে।